ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা
[Secularism in India]

অধ্যায়সূচী
|| ① ভূমিকা ② ভারত ও ধর্ম ③ ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণা ④ ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতা ⑤ ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধকসমূহ ||

১০.১ ভূমিকা (Introduction)

এক সময় ইউরোপে সব রকম সম্পত্তির উপর চার্চের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। চার্চের সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পত্তির ব্যবহার করা যেত না। কালক্রমে কিছু বুদ্ধিজীবী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হন। এই বুদ্ধিজীবীরা 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসাবে চিহ্নিত হন। সুতরাং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে ইউরোপে। এই সময় ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে 'চার্চ থেকে স্বতন্ত্র' বা 'চার্চের বিরোধী' এই ধারণা ব্যক্ত হত। আভিধানিক অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়াদির সঙ্গে সম্পর্করহিত বিষয়কে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ভারত-রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হল। ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্য তিনটি বিষয় তুলে ধরা হল। এই তিনটি বিষয় হল : (১) ধর্ম স্বীকার ও প্রচারের ব্যাপারে প্রত্যেক নাগরিকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে; (২) রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকবে না; এবং (৩) ধর্মবিশ্বাস যাইহোক্ না কেন সকল নাগরিক হবে সমান। এইভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মত অজ্ঞাবাদীদেরও সমানাধিকার প্রদান করা হল। বস্তুত ভারতবিভাগের পর এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আস্থার ভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সমকালীন ভারতের জননেতারা বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রকর্ণধাররা চাইছিলেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হোক্ যে, ভারতে তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনা ঘটবে না।

সুতরাং 'ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ' এ কথার অর্থ এই নয় যে ভারতরাষ্ট্র অধার্মিক বা ধর্মবিরোধী নয়। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায় বর্তমান। প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠী যে যার ধর্মের শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান স্বীকার ও পালন করে। রাষ্ট্র বা অন্য কোন সংস্থা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিধিসম্মত ধর্মাচরণ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (১) রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; (২) সকল ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; এবং (৩) ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং অজ্ঞাবাদীদেরও যে যার বিশ্বাস অনুসরণের স্বাধীনতা।

ভারতে রাজনীতিক দলগুলির কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা হল ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার একটি সুযোগ। মুসলমান, তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিদের নিয়ে এই ভোটব্যাঙ্ক তৈরীর সুযোগ ব্যবহার করা যায়। ভারতে রাজনীতিক দলগুলি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলে ভোট আদায়ের জন্য এবং রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের জন্য। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিকভাবে অভিপ্রেত যে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা এবং নেতারা রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করবে না। ভারতে বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য রকম। এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে থাকে। অথচ প্রতিটি রাজনীতিক দল বিরোধী দল বা দলগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী বা সাম্প্রদায়িক বলে অভিযুক্ত করে। অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Social Problems in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "The power seekers --- use secularism as a shield to hide their sins, thereby ensuring that people remain polarized on the basis of religion and India remains communalized."

১০.২. ভারত ও ধর্ম (India and Religion)

ভারতে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা।। মানবজাতির ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ বর্তমান। কিন্তু সকল ধর্মেই শান্তি-সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়। ধর্মমাত্রই মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ ও বিস্তারের উপর জোর দেয়। কোন ধর্মেই হিংসা-হানাহানি বা দ্বন্দ্ব-বিবাদের কথা বলা হয় না। এ কথা

সাধারণভাবে সত্য। এতদ্‌সত্ত্বেও ধর্মকে কেন্দ্র করে মর্মান্তিক সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনার অভাব নেই। মানবজাতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার ভিড় অনস্বীকার্য। এবং এ ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য বিশেষভাবে বিরূপ। ভারতের ইতিহাসে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকার অনেক উদাহরণ আছে। ভারত ইতিহাসের বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক দুর্ভাগ্যজনক তথা কলঙ্কজনক ঘটনা হল দেশ-বিভাগের ঘটনা। এ দেশের একদল মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হল ভারত বিভাগের ঘটনা। দেশ-বিভাগের পরেও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয়নি। তারপরও দুটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। এস. এল. সিক্রি (S. L. Sikri) তাঁর *Indian Government and Politics* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "The acquiescence of the Congress in the demand of the Muslim League for Pakistan was a virtual surrender to communalism. Thus communalism is a historical legacy of the past." বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিপন্ন হয়।

স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী ।। ভারতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ব্রিটিশ আমলেই। বিশাল ও জনবহুল ভারতের উপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য ব্রিটিশ সরকার 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule) নীতি অনুসরণ করে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিচারে 'বিভাজন ও শাসন' এই ব্রিটিশ নীতির কুফল পরবর্তীকালে ভারতবাসীকে ভুগতে হয়। ভারতের সংবিধান প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় এই কুফলের প্রভাব পড়েছে। ভারতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীর 'কনস্টিটিউশন হলে'। মুসলিম লীগের সদস্যারা এই অধিবেশনে আসেন নি। মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে অনড় থাকে। অবশেষে এই দাবি মেনে দেশবিভাগের ঘটনা ঘটে এবং ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। ভারত বিভাগের পর অসংখ্য মুসলমান পরিবার ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান এবং অসংখ্য হিন্দু পরিবার পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসেন। কিছু মুসলমান পরিবার প্রাথমিক ভীতিতে পাকিস্তানে চলে গেলেও, তাঁরা আবার ভারতে ফিরে আসার কথা ভাবতে থাকেন। দেশ বিভাগের পরেও অসংখ্য মুসলমান পরিবার ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তা ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ও ভারতে বসবাস করছিলেন। উদাহরণ হিসাবে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রীস্টানদের কথা বলা দরকার। স্বাধীন ভারতে সামগ্রিক বিচারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মোট সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ স্বাধীন ভারত হল একটি বহু ও বিভিন্ন ধর্মীয় জনসম্প্রদায়ের দেশ। স্বভাবতই ভারতকে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের বাসভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে প্রতিপন্ন হয়।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তি ।। ধর্মের ভিত্তিতে এই দেশবিভাগের ঘটনা এবং দেশের সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। দেশ বিভাগের পরেও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নি। তারপরও দুটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন ধর্মের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের আশংকার কথা বিবেচনা করে সংবিধানে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' (Secular State) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত নীতিই হল ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তি। এ হল মহম্মদ আলি জিন্নার 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের যোগ্য জবাব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির জন্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে। এস. এল. সিক্রি (S.L. Sikri) তাঁর *Indian Government and Politics* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "In the midst of bloodshed and communal passion, the founders of the Indian state repudiated the false and basically inhuman doctrine of communalisms and made secularism the sheet anchor of India's unity."

মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ছিল না ।। ভারতের মূল সংবিধানের কোথাও 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি ব্যবহার করা হয় নি। ধর্ম-নিরপেক্ষতার এই অনুল্লেখ অনবধানতাবশতঃ কোন বিচ্যুতি নয়। চিন্তা-ভাবনা করেই ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটিকে সংবিধান-প্রণেতারা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এ বিষয়ে গণপরিষদে আলোচনার প্রাক্কালে অধ্যাপক কে. টি. শাহ (K. T. Shah) বার দুয়েক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এই উদ্যোগ সফল হয় নি। অধ্যাপক শাহ-র প্রস্তাব স্বীকার করতে ড. আম্‌বেদ্‌কর (Dr. B. R. Ambedkar) সম্মত হন নি। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, আম্‌বেদ্‌কর আলাদা করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটির উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য বলে মনে করেছেন। কারণ সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই চিন্তা, বাক্য, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ঐ প্রস্তাবনাতেই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে

সমতার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার হিসাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ সব থেকে ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। যাই হোক পরবর্তীকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার গোড়ার দিকেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রী দুর্গাদাস বসু (D.D. Basu) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "The 'secular' nature of our Constitution has been further highlighted by inserting this word in the Preamble, ... "

বর্তমান ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা অতি আলোচিত বিষয় ।। ধর্মীয় সম্প্রীতি ভারতের বরাবরের আদর্শ। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা সনাতন ভারতের প্রাচীন আদর্শ। ভারত রাষ্ট্রের সরকারী আদর্শই হল ধর্মনিরপেক্ষতা। ভারতের সংবিধান-রচয়িতারা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে একটি উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সংবিধান-প্রণেতারা বা পরবর্তীকালে তাঁদের উত্তরসূরীরা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেন নি। রাজনীতিক আলোচনায় সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের রাজনীতিকরণ, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতিযেধক এক মতাদর্শকে বোঝায়। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় পরিণত হয়েছে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাবরি মসজিদের কাঠামোটিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্বাভাবিক জনজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। ভারতের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ্‌রা ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আপাতবিচারে মনে হয় যে, ভারতে রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের কুশীলবরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং অ-ধর্মনিরপেক্ষ— এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতের অধিকাংশ রাজনীতিক দল বা গোষ্ঠী ভারতীয় জনতা পার্টিকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অপরদিকে বি. জে. পি. ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনীতিক দলগুলিকে ছদ্ম বা জাল ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপোষক হিসাবে প্রতিপন্ন করে। বি. জে. পি.-র অভিযোগ অনুসারে এই সমস্ত রাজনীতিক দলের মুসলমান-শোষণ নীতির অন্য নাম হল ধর্মনিরপেক্ষতা। বি.জে.পি. নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসাবে দাবি করে। ভারতের বি.জে.পি-বিরোধী রাজনীতিক দলগুলি বি.জে.পি-র হিন্দুত্বের মতাদর্শ ও বি.জে.পি মার্কা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করার জন্য বিভিন্নভাবে উদ্যোগী হয়। বস্তুত বর্তমান ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি অতি আলোচনার শিকার হয়েছে। এবং এই কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তির অস্তিত্বের আশঙ্কা অনস্বীকার্য।

১০.৩ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা (Concept of Secularism)

পশ্চিমী ধারণা ।। ১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংশোধনী আইনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সংবিধানের কোথাও ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। সমাজবিজ্ঞানীদের মতানুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মূলে পশ্চিমী মতাদর্শ বর্তমান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক মৌলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারকে কেন্দ্র করে ইউরোপে পোপ ও রাজার মধ্যে বা চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে দ্বন্দ্ব-বিবাদ অব্যাহত ছিল। অবশেষে জাগতিক সকল বিষয়ে রাজা বা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব কায়েম হয়। এই সময় থেকে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা যুক্ত। বলা হয় যে এই রাষ্ট্র পার্থিব বিষয়াদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই রাষ্ট্র ধর্মীয় নীতি-নির্দেশের অধীন নয়। অর্থাৎ ধর্মের এলাকা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এলাকাকে একেবারে আলাদা করা হয়। পশ্চিমী দুনিয়ায় দীর্ঘ তিন দশকের অধিককাল ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। বিশ্বজনীন মানবিকতাবাদ, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বৌদ্ধিক মূল নিহিত আছে। এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার অভিব্যক্তি ঘটে মূলত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্করহিত চিন্তাধারা ও কাজকর্মের মাধ্যমে।

পশ্চিমী অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ।। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত পশ্চিমী ধারণা হল সংকীর্ণ। পশ্চিমী ধারণা অনুযায়ী বা সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা হল 'ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা' (absence of connection with religion)। এ দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় সাধারণ জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা (to isolate religion from the more significant areas of common life)। লিও ফিফার (Leo Pfeffer)—এর অভিমত অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হল রাষ্ট্র থেকে গীর্জাকে পৃথক রাখা। কিন্তু ভারতে এমন সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করা হয় নি।

সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয় নি ।। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায়

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ বরাবরই ভারত হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, ভারত-রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী বা এদেশে ধর্মের কোনও স্থান নেই। পানিক্কর (K. M. Panikkar) *The Foundation of New India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "The Indian State by becoming secular has not become irreligious. Its secularism is negative in the sense of not permitting religious considerations to enter into the principle of state action." কামাথ (H.V. Kamath)-এর মতানুসারে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে দেবতাহীন রাষ্ট্র, অধার্মিক রাষ্ট্র বা ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রকে বোঝায় না।' তিনি বলেছেন ঃ "To my mind, a secular state is neither a godless state nor an irreligious state nor an anti-religious state." রাধাকৃষ্ণণ (Radhakrishnan) তাঁর *Recovery of Faith* গ্রন্থে বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক, ধর্মবিরোধী বা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন রাষ্ট্রকে বোঝান হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে গণপরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার সমর্থনে সব সময়ই জোরদার যুক্তি খাড়া করেছেন। কিন্তু তিনিও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন: "We call our state a 'secular' one. The word 'secular' perhaps is not a happy one. And yet for want of a better word we have used it."

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে গান্ধীজি ও নেহরুজীর ধারণা ॥ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রধান দুই পৃষ্ঠপোষক হলেন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এ বিষয়ে রুডল্ফ (Lloyd I. Rudolph) তাঁর *Cultural Policy of India* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মূল কথা হল ধর্মীয় জনসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে আন্তরিক অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার সত্যের জন্য শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিত নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানবিকতাবাদের আদর্শের কথাই বেশী। তিনি বলেছেন: "In the secular state of India, every religion and belief has full freedom and equal honour, and every citizen has equal liberty and equal opportunity. The minorities are given fair and just treatment and equitable educational and economic facilities. There is freedom of conscience even for those who have no religion...free play for all religious subject only to not interfering with each other or with the basic conception of our state."

ব্যাপক ও ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ॥ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এখানে এই যে, ভারত ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এখানে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। বলা হয় যে, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ হল মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তার নিজ নিজ বিবেক ও বিশ্বাস অনুসারে, তাদের স্বতন্ত্র অন্তরের আকুতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাচরণ করে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল মানুষেরই, সকল গোষ্ঠীরই একই ধরনের বাহ্যিক আচরণ প্রত্যাশিত। সুতরাং নাগরিকের সঙ্গে নাগরিকের, বা রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সেখানে কোনরকম বৈষম্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়। ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্যের নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের দিক থেকে কোন বিশেষ আচরণ কাম্য নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম প্রত্যয় হল ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। এই কারণে বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অপরিহার্য ও প্রগতিশীল নীতি হিসাবে স্বীকৃত। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানে সযত্ন প্রচেষ্টা বর্তমান।

ভারতীয় অর্থে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা ॥ ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বা ধর্মবিরোধিতা বোঝায় না। বলা হয় যে রাষ্ট্র যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও ধর্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। ভেঙ্কটরমন (Venkataraman) বলেছেন: "The State is neither religious, nor irreligious, nor antireligious, but it is wholly detached from religious dogmas and activities and thus neutral in religious matters." অর্থাৎ ভারতে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। রাষ্ট্র যে-কোন ধর্মের সংস্রব এড়িয়ে চলবে। কোন ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করবে এবং মানুষকে ধর্মীয় বিবেচনা ছাড়াই কেবল মানুষ হিসাবে গণ্য করবে। স্মিথ (D. E. Smith) বলেছেন: "The secular state is a state which guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual as a citizen irrespective of his religion." রাষ্ট্রের কাজকর্ম মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে, মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাসকে নিয়ে নয়। মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাস সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন দায়দায়িত্ব নেই। ধর্মবিশ্বাস মানুষের

DEPARTMENT LIBRARY

সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলবে। আম্বেদকর (Ambedkar)-এর মতানুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থ রাষ্ট্র জনগণের উপর কোন ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেবে না। তিনি বলেছেন: "All that a secular state means is that this Parliament shall not be competent to impose any particular religion upon the rest of the people." ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকলকেই সমানভাবে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা দিতে হবে! পণ্ডিত নেহরু (Nehru) বলেছেন: "We call our state a secular one..... It means freedom of religion and conscience, including freedom for those who may have no religion." **জিয়াউদ্দিন বুখারী বনাম ব্রিজমোহন রামদাস মেহরা ও অন্যান্য** (১৯৭৫) মামলায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বেগ (M. H. Beg) রায় দিতে গিয়ে বলেছেন: "The secular State, rising above all differences of religion, attempts to secure the good of all its citizens irrespective of their religious belief and practices. It is neutral or impartial in extending the benefits to citizens of all castes and creeds." ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে গণপরিষদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধান-প্রণেতাদের অনেকেই এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্রের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "By secular states......is meant that the state is not going to make any discrimination whatsoever on the ground of religion of community against any person professing any particular form of religious faith.....no particular religion in the state will receive any state patronage whatsoever. The state is not going to establish, patronise or endow any particular religion, to the exclusion of, or in preference to, others, in the affairs of the state, the professing of any particular religion will not be taken into consideration at all..... At the same time, we must be very careful to see that in this land of ours we do not deny to anybody the right not only to profess or practise but also to propagate any particular religion."

অধ্যাপক জোহারীর পর্যালোচনা ॥ অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (১) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত উদার (liberal)। ধর্ম-বিষয়ে সকলের সমানাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়গুলির জন্য কিছু বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। শিখদের 'কৃপাণ ধারণের' এবং খ্রীস্টানদের 'ধর্মপ্রচারের' অধিকার দেওয়া হয়েছে। হিন্দুরা এখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় আশি শতাংশ। কিন্তু হিন্দু-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেই কেবল সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। (২) ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বিশেষভাবে গতিশীল (dynamic)। রাষ্ট্র জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় বিধিরীতি লঙ্ঘন করেও আইন তৈরি করতে পারে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্রগাদকর (P. B. Gajendragadkar) বলেছেন: "Secularism under the Indian Constitution is not merely a political doctrine. It is not a passive or negative doctrine. It is a comprehensive forward looking dynamic doctrine." (৩) ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি নিয়ন্ত্রিত (qualified) — অনিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ কখনই ব্যক্তিগত আইন (personal law) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে থাকতে পারে না। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। (৪) ভারতে রাজনীতিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে ধর্মের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

১০.৪ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism in India)

গণপরিষদে আলোচনার প্রাক্কালে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি সংবিধান রচয়িতাদের বিশেষ আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে। অনন্তশায়ানম আয়েঙ্গার (Ananthsayanam Ayyangar) বলেছেন: "We are pledged to make the state a secular one." জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। অধ্যাপক জোহারী (J.C. Johari) বলেছেন: "The guarantee of fundamental right relating to religion constitutes the sheet-anchor of our secular state."

ব্যক্তির ধর্মের স্বাধীনতা ॥ ভারতীয় সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮—এই চারটি ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সংবিধানের ২৫ ধারা অনুসারে সকল ব্যক্তিই সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা

অনুসারে ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ এবং ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে। ব্যক্তি তার বিবেক অনুসারে ধর্মমত অবলম্বন করার অধিকার ছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করার এবং ধর্মীয় মতামত প্রচার করার অধিকারও ভোগ করবে [রতিলাল বনাম মুম্বাই (বোম্বাই) রাজ্য সরকার (১৯৫৪)]। রাষ্ট্র সাধারণত কোন ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিনা আদালত তা নির্ধারণ করতে পারবে [হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য (১৯৫৮)]।

ধর্মীয় স্বাধীনতা অবাধ নয় ॥ এই অধিকারটি অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। জনশৃঙ্খলা, সদাচার, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। তা ছাড়া রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে জড়িত যে-কোন অর্থনৈতিক (economic), বৈত্তিক (financial), রাজনৈতিক (Political) বা ধর্মনিরপেক্ষতা (secular) সম্পর্কিত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [২৫(২) (ক) ধারা]। আবার সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক সংস্কারসাধন বা জনপ্রতিনিধিমূলক হিন্দু ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশাধিকারের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে। [২৫(২) (খ) ধারা]। 'হিন্দু' বলতে শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীদেরও বোঝাবে। শিখ ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে শিখগণ কৃপাণ ধারণ ও বহন করতে পারবে। সম্প্রতি এ বিষয়ে শিখদের অকালী গোষ্ঠী ভিন্ন দাবি ঘোষণা করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থাকে অযৌক্তিক বলা যায় না। কারণ কোন ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে না। তেমনি আবার ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে সতীদাহ, দেবদাসী প্রভৃতি কু-প্রথাকে মেনে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার ॥ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও কতকগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (ক) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে; (খ) ধর্মীয় বিষয়ে নিজ নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে; (গ) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে ও মালিক হতে পারবে এবং (ঘ) আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে রাষ্ট্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপরিউক্ত অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কোন ধর্মসম্প্রদায় 'তত্ত্বাবধানের' অধিকারের অজুহাতে কোন সভ্যকে একঘরে বা ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করতে পারে না [তাহের বনাম তায়ে ভাই (১৯৫৩)]।

বিশেষ ধর্মের উপর কর আরোপ নিষিদ্ধ ॥ কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না (২৭ ধারা)। ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে এই জাতীয় কর আরোপ নিষিদ্ধ হয়েছে। তা ছাড়া ২৭ ধারার আর একটি উদ্দেশ্য হল এক ধর্মসম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে অন্য সম্প্রদায়কে রক্ষা করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা ॥ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ ধারায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম-নিষেধের উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) পুরোপুরি সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান একেবারে নিষিদ্ধ। (২) কিন্তু সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা সরকারী অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান একেবারে নিষিদ্ধ হয় নি। তবে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি দরকার। (৩) সম্পূর্ণ বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় নি। কোন দাতা বা অছি কর্তৃক ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হলেও সেখানে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে।

২৫ থেকে ২৮ ধারা ছাড়া সংবিধানের অন্যান্য অংশেও ধর্মীয় অধিকারের উল্লেখ আছে। প্রস্তাবনায় চিন্তা, বাক্য, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা আছে। ১৪ ধারায় আইনের চক্ষে সকলের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৫ ও ১৬ ধারায় কেবল ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতাকে অবলুপ্ত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। ২৯(২) ধারায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং ৩২৫ ধারায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ হয়েছে। ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সংবিধানে বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বিচার-বিবেচনাকে সংবিধানে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। আবার গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগের প্রাক্কালে শপথ নেওয়ার ব্যাপারে আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে বৈষম্য করা হয় নি। এ বিষয়ে সংবিধানের

তৃতীয় তফসিলে উল্লেখ আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ ভগবানের নামে শপথ নিতে পারেন। বিপরীতক্রমে যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, তাঁরা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে পারেন।

ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নৈতিকতা বা সদাচারের স্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এবং এ ক্ষেত্রে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্যান্য বিধি-নিষেধও প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ও সদাচারের সংঘাত দেখা দিলে বা তৃতীয় অধ্যায়ের অন্য কোন বিধি-নিষেধের বিরোধ বাধলে ধর্মকেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। ধর্ম শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করতে পারে না বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ বসবাস করে। সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুণ্যভূমি ভারতে সকল ধর্মই সমান। বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকার ও কার্যকর হয়েছে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের জন্যই ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। শ্রীদুর্গাদাস বসু (D. D. Basu) বলেছেন: "The sum-total of the above provisions make our State more secular than even the United States of America. The 'secular' nature of our Constitution has been further highlighted by inserting this word in the Preamble,...." ভারতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে যে-কোন রাজনৈতিক পদে নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্যের নজির হিসাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তিন বার ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যায়। ড. জাকির হোসেন এবং ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনীতিক পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং বর্তমানে ড এ. পি. আব্দুল কালাম রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আবার মহম্মদ হিদায়েতুল্লা উপরাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়েছেন। এঁরা তিনজনেই ছিলেন মুসলমান। তেমনি আবার জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। তিনি সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্যের এমন নজির পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং ভারত হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে ধর্মের নামে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না।

ডোনাল্ড স্মিথের পর্যালোচনা ॥ রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী স্মিথ (Donald Eugene Smith) ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর গভীর গবেষণামূলক কাজকর্ম সম্পাদন করেছেন। স্মিথের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্র ও ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় অথবা পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র থাকে ব্যক্তির জন্যই। সুতরাং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যক্তিই হল কেন্দ্রীয় বিষয়। স্মিথ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিকে তিন দিক থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এই তিনটি দিক হল ঃ (এক), ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতা, অর্থাৎ ব্যক্তি ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক, (দুই), নাগরিকতা, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক; এবং (তিন), রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক বা উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য।

(এক) ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা বা ব্যক্তি ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক

কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে সংযুক্ত হতে পারে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। মানুষ ধর্মের সাংগঠনিক বিষয়ে যোগ দিতে পারে এবং ধর্মীয় মতামত প্রচার ও অনুসরণ করতে পারে। আবার কোন ব্যক্তি ধর্মের সঙ্গে কোন রকম সংযোগ-সম্পর্ক নাও রাখতে পারে। গোষ্ঠীগত পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সামিল হতে পারে, স্থায়ী ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারে। তেমনি আবার ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গ বিষয়-সম্পত্তি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। অর্থাৎ ব্যক্তির ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতা আছে এবং আপাত বিচারে ব্যক্তি ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কিছু বলার থাকতে পারে না। কোন একটি ধর্মমত অনুসরণের ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে আবার কোন একটি ধর্মকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও রাষ্ট্র কাউকে বাধ্য করতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নৈতিকতা, নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের কারণে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

(দুই) রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক বা নাগরিকতা

রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও সমাজব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ নয় ॥ রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ। এ বিষয়ে খুব বেশী বিতর্কের অবকাশ নেই। কারণ, সাংবিধানিক

বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনা বহুলাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু ভারতের সমাজব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ভারতের সামাজিক পরিকাঠামো এবং জীবনধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার আশঙ্কাজনক অভাব অনস্বীকার্য। সমাজজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের অনুপস্থিতি অনেক সময় রাজনীতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিকূল প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ভারতে সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব বিভিন্ন সময়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দাঙ্গার কথা বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ, মুসলমানদের সিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ, অকালি শিখ ও নিরঙ্কারীদের মধ্যে বিরোধ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খ্রীস্টানদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিরোধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ধর্মান্তরিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতিগত বিবাদ-বিসংবাদের ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ ভারতের ভাষা-আন্দোলনও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া আঞ্চলিকতাবাদজনিত বিবাদ-বিসংবাদকেও এ ক্ষেত্রে অবহেলা করা যায় না। উল্লিখিত বিষয়াদি সূত্রে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের সমাজব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতের নাগরিকতা ॥ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক হিসাবে নাগরিকতা সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ভারতে আগেকার দিনে অধিবাসীদের নাগরিকতার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হত। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বর্তমান ভারতে নাগরিকতার বিষয়টি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্করহিত। নাগরিকতা অর্জনের শর্তাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়াদিকে বিচার-বিবেচনার মধ্যে আনে না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্র নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষকে নিয়েই বিচার-বিবেচনা করে; ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে উপেক্ষা করে। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের উপর ব্যক্তির ধর্ম কোন রকম প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। ভারতের সংবিধানে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে; কিন্তু ধর্মীয় কারণে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের উপর কোন রকম সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় নি। সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও আইনের সমান সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ১৫নং অনুচ্ছেদে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৬নং অনুচ্ছেদেও নাগরিকদের ধর্মের থেকে পৃথকভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এবং সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনাকে কোন জায়গা দেওয়া হয়নি। ১৭নং অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অস্পৃশ্যতার যে-কোন রকম আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২৯নং ধারায় সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনাকে বাতিল করা হয়েছে। তা ছাড়া ৫১ক ধারায় নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করার কথা বলা হয়েছে।

(তিন) রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক বা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়েই পরস্পরের থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও ধর্ম স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়। মানুষের জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ও ধর্মের এক্তিয়ার আলাদা; স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে এদের কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে কোন সরকারী ধর্ম থাকে না বা সরকার কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। কোন বিশেষ ধর্মের বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন রকম দায়-দায়িত্ব থাকে না। ধর্মীয় বিষয়াদিতে রাষ্ট্র নাক গলায় না বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। তবে রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে ধর্মের অস্তিত্বকে রাষ্ট্র অস্বীকার করে না। রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্যই এটা দরকার। আবার ধর্মেরও কিন্তু রাজনীতিক ক্ষমতা অর্জনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। অর্থাৎ ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকে। তবে এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাষ্ট্র প্রয়োজনে ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এ বিষয়ে রাষ্ট্রের উপর বাধা-নিষেধ থাকে না। বস্তুত রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেই ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহকে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে।

সরকার সকল ধর্মীয় বিষয়ে নিস্পৃহ থাকতে পারে না ॥ ভারতে রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সতত সংরক্ষিত হয়। এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সরকার ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকে না। ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। এ রকম বিষয়ের উদাহরণ হিসাবে মঠ-মন্দিরের বিষয়-সম্পত্তি, ব্যক্তিগত আইনের সংশোধন এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার হিন্দুদের মঠ-মন্দিরের মালিকানায় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও বিবিধ প্রতীকী জিনিসপত্র থাকে। সংশ্লিষ্ট সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠীসমূহের কাছে এ সবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এই সমস্ত সম্পদ-সামগ্রীর ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিধিব্যবস্থা বিরোধ-বিতর্ক বা

জনজীবনে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। স্বভাবতই সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকতে পারে না। ভারতে তামিলনাড়ু সরকার হিন্দু মন্দিরসমূহের উপর বিশেষ তদারকির ব্যবস্থা করে। রাজ্য সরকারের বিশাল আমলা-বাহিনীর একটি অংশ এই তদারকির কাজে নিযুক্ত থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, জম্মুর শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবীর পবিত্র মন্দির হল তীর্থযাত্রীদের কাছে এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্রটিতে অব্যবস্থার অবসানের জন্য ১৯৮৬ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল জগমোহন কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তেমনি হিন্দু তীর্থক্ষেত্র দুর্গম অমরনাথ দর্শনের সমগ্র বিষয়টি সরকারী তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থার উপর ওড়িশা সরকারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম আছে। তা ছাড়া পুরীর এই বিখ্যাত মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ওড়িশা সরকারের পূর্তবিভাগের উদ্যোগ-আয়োজন অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকার সমর্থনে বলা হয় যে, এই সমস্ত মঠ-মন্দির হল জনসাধারণের সম্পত্তি। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারের সরাসরি কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। ভারতের সুপ্রীমকোর্টও এই ব্যাখ্যার সাংবিধানিকতাকে স্বীকার করেছে।

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণও ধর্মনির- পেক্ষ তার পরিচায়ক॥ আবার অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ে সংবিধান রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। ভারতে কোন সরকারী ধর্ম নেই, এখানে ধর্মীয় কারণে কোন কর আরোপ করা হয় না, ধর্মীয় ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ, কোন বিশেষ ধর্ম অবলম্বনের জন্য, কাউকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, জনজীবনে সকলের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সাম্য বর্তমান প্রভৃতি। ভারতের সংবিধান-রচয়িতারা ধর্মনিরপেক্ষতার উপর বিশেষ ও মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং তদনুসারে সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে বহু ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বর্তমান। এই সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবস্থান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিকে সুসংহতভাবে প্রতিপন্ন করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বাভাবিক অভিভাবক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবস্থাকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে পারলে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে সম্যকভাবে প্রতিপন্ন করতে পারবে। এ বিষয়ে ভারতের মুসলমান, শিখ ও খ্রীস্টানদের সম্যক উপলব্ধি আছে।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা সুদৃঢ় ॥ ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বর্তমান। সনাতন ভারতে সব সময় বহু ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করেছে। ভারত ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই এমন নজির পাওয়া যাবে না যখন ভারতে কোন অ-হিন্দু জনসম্প্রদায়ের বসবাস ছিল না। ব্রিটিশ আমলে আইন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি বজায় ছিল। তবে অনেকের অভিযোগ অনুযায়ী বিশাল ভারতের বিপুল জনগোষ্ঠীর উপর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য বিদেশী ব্রিটিশ সরকার এদেশের বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে 'বিভাজন ও শাসন'-এর নীতি অনুসরণ করেছে। রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় নি। স্বাধীন ভারতের সরকারও সব সময় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে আন্তরিক সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছে। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় বা প্রক্রিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে কার্যকর করার স্বার্থে সরকার সতত সক্রিয় আছে। অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে সহায়ক ও সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই। অস্পৃশ্যতার অবসানের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক ও অন্যবিধ বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার শত্রুতার মোকাবিলার জন্য সরকার আইনী ও অন্যান্য পথে সতত সক্রিয়। স্বভাবতই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা বিশেষভাবে সুদৃঢ়। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও সুদৃঢ়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি হিন্দুধর্মের অনুমোদন বর্তমান। হিন্দুধর্মের বিবেকের স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতার সনাতন ও মহান আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে দৃঢ়ভিত্তিক করেছে। তাছাড়া হিন্দুরাও একবভাবে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে সংগঠিত নয়। হিন্দুদের মধ্যে বহু ও বিভিন্ন গোষ্ঠী বর্তমান। হিন্দুদের এই সমস্ত গোষ্ঠী কোন অ-হিন্দু জনসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিবৃদ্ধি ॥ বর্তমানে উন্নয়নশীল যে-কোন দেশের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের অনুসরণকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা হয়। এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং সাধুবাদ জানান দরকার। আধুনিক ভারত হল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সম্যক বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সামগ্রিক ও সদর্থক উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। ভারতের বিচার-বিভাগ সাংবিধানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে পরিপুষ্ট করেছে।

দেশের অধিকাংশ রাজনীতিক দলও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। স্বাধীন ভারতে অ-সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরার ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এবং এ বিষয়ে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলগুলির উদ্যোগ-আয়োজন অনস্বীকার্য। এই সমস্ত রাজনীতিক দল দেশের সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়সমূহের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পরিগণিত হয়। ভারতীয়দের সমাজব্যবস্থায় সংগঠিত শক্তি হিসাবে ধর্মের ভূমিকা অনেকাংশে হীনবল হয়ে পড়েছে। তার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি অধিকতর জোরদার হয়েছে। তা ছাড়া আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি শক্তিশালী হয়ে পড়ার পিছনে অন্যান্য উপাদানের অবদানও অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে শিক্ষার বিস্তার, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিকীকরণ, যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনধারায় উদারনীতির প্রচলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত আধুনিক আর্থ-সামাজিক উপাদান ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনধারাকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে।

১০.৫ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Hindrances to Secularism in India)

বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত অনুযায়ী ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হীনবল হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বিষয় ও শক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বহু ও বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণার অস্বচ্ছতা, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্যে পরিচালিত সরকারী কার্যপ্রক্রিয়া প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। তবে সাম্প্রদায়িকতা হল এ ক্ষেত্রে একটি বড় বিপদ। ভারতে সাম্প্রদায়িক আনুগত্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এবং এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অনেক ক্ষেত্রেই হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। তার ফলে স্বাভাবিক জনজীবন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যাইহোক, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী ঘটনাবলী ও শক্তিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

(এক) **ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ও তার প্রয়োগ প্রসঙ্গে সমস্যা ॥** ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার সামনে বহু ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি বর্তমান। এই সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সম্পর্কিত বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, নাকি সকল ধর্মের প্রতি সমভাব বা সকল ধর্মের প্রতি সমর্থন রাষ্ট্রের দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা হিসাবে বিবেচিত হবে—এ বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমান। এ বিষয়ে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। ভারত রাষ্ট্র কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না; কিন্তু সকল ধর্মের সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত সাংবিধানিক ধারণা এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম ব্যাখ্যা হিসাবে 'সর্ব ধর্ম সমভাব'—এই ধারণার কথা বলা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাখ্যা হল সরকারের আধিকারিকদের ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী কাজকর্মকে যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করা। 'সর্ব ধর্ম সমভাব' বা সকল ধর্মের প্রতি সম শ্রদ্ধা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মীয় বিষয়াদিতে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অবস্থান সমার্থক নয়। ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের অভিমত অনুযায়ী ভারত হল বহু ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাসভূমি। এখানে বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মানুশাসনের ভিত্তিতে সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির উপর জোর দেওয়া দরকার। তাহলে ভারতীয় রাজনীতিক প্রক্রিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতাকরণ সম্ভব হবে। এবং এই পথে সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে। অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি সাধনের উপর জোর দিতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িকতার অবসান বা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজনীতির উপর জোর দেওয়া হয় নি, বরং সাম্প্রদায়িকতাকে জনকল্যাণের ধারণার আবরণে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বিদ্যমান ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মানিয়ে চলার কথা বলা হয়। এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতানুসারে জনসমক্ষে সকল ধর্মশাস্ত্রের পাঠ হল ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ, কিন্তু একটি ধর্মশাস্ত্রের পাঠ হল সাম্প্রদায়িক আচরণ। কিন্তু এ রকম আধ্যাত্মিক ও নীতিজ্ঞানমূলক বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা বা যুক্তিসঙ্গতভাবে রাজনীতিক সংহতি সাধন সম্ভব নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ধারণায় ধর্মনিরপেক্ষতার কতকগুলি মৌলিক বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই মূল বিষয়গুলি হল ঃ ধর্মীয় মতান্ধতা ও কুসংস্কার থেকে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা; আধ্যাত্মিকতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে সমাজ জীবনকে স্বতন্ত্র করা।

সকল ধর্মের প্রতি সমভাব ধর্মনিরপেক্ষ-তার বিপজ্জনক ধারণা ॥ 'সর্ব ধর্ম সমভাব'—ধর্মনিরপেক্ষতার এই দর্শন বিপজ্জনক। সকল ধর্মের প্রতি সম-পৃষ্ঠপোষকতা বা কৃষ্টিগত কল্যাণ-সাধন ধর্মনিরপেক্ষতা বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ কোন রাষ্ট্রই দেশের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সমভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র পবিত্রতা অ-পবিত্রতার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ধর্মনিরপেক্ষ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; আধ্যাত্মিকতার এলাকায় কোনভাবে প্রবেশ করবে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্ণধাররা বা সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা রাজনীতিক ক্ষেত্রে বা সর্বসমক্ষে নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অভ্যাসকে প্রদর্শনীর বিষয় করবেন না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা ধর্মীয় পীঠস্থানের পূজা-অর্চনার প্রতিপাদ উদ্যোগ-আয়োজন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবেন। এ ধরনের রাষ্ট্র কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা পীঠস্থানের প্রতি আর্থিক বা অন্যবিধ আনুকূল্য প্রদর্শন করবে না। ধর্মীয় বিবাদ-বিসংবাদ সূত্রে জনজীবনে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে রাষ্ট্র কার্যকর আইনানুগ ব্যবস্থাদি অবলম্বন করবে। ধর্মীয় বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতার বা সালিশীর ভূমিকা গ্রহণ করবে না। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ্ বিবাদে নরসিম্হা রাও-এর সরকার মধ্যস্থতার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছিল। বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত অনুসারে এ ধরনের উদ্যোগ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসুলভ নয়। তাঁরা এ জাতীয় উদ্যোগের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। সংঘ পরিবার বাবরি মস্জিদ্‌কে ধ্বংস করে। নরসিম্হা রাও-এর সরকার বাবরি মস্জিদকে রক্ষা করতে পারে নি।

(দুই) জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য- জনিত অতিসচেতনতা ॥ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য দেশবাসীর মধ্যে একটি যৌগিক জীবনধারা গড়ে তোলা দরকার এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংহতি সাধনের ব্যাপারে সদর্থক উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত আত্মসচেতনতা এবং স্বতন্ত্র ধর্মীয় অভিব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। এস. এল.সিক্রি (S.L. Sikri) তাঁর *Indian Government and Politics* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেনঃ "The religious manifestations and greater self-awareness of religious communities are generally taken as anithetical to secularism." ভারতে বহু ও বিভিন্ন জাতি সত্তার মানুষ বসবাস করে। পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এই সমস্ত জাতিসত্তার মধ্যে অতি-সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যমূলক সচেতনতা সূত্রে বিভিন্ন জাতিগত বাধা-নিষেধ বা সংস্কারের সৃষ্টি হয়। গুজরাট ও সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কিছু ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীকে জাতিগত উর্ধ্বাধঃ স্তরবিন্যাসে অত্যন্ত নিম্নস্তরের বলে বিবেচনা করা হয়। কর্ণাটকে বিশেষ একটি ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর কাছ থেকে অ-ব্রাহ্মণ জাতিসমূহের মানুষজন, এমনকি হরিজনরাও খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে না। জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যজনিত এই অতিসচেতনতা ধর্মনিরপেক্ষতার পথে একটি বড় বাধা হিসাবে বিবেচিত হয়।

(তিন) ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ-ভিত্তিক আন্দোলনের অভাব ॥ বহু ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ পুণ্যভূমি এই ভারত। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে আস্থাশীল মানুষের অভাব নেই। কিন্তু ভারতের এই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষগুলিকে সংগঠিত করার কোন সদর্থক উদ্যোগ-আয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। গান্ধী-নেহরু-লালবাহাদুরের আমলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিপন্ন হত। ভারতবাসীর ধর্মনিরপেক্ষ অংশ কংগ্রেসের মধ্যেই তাদের নিরাপত্তা ও নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছিল। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কংগ্রেসী নেতারা তাঁদের বিশ্বাস-যোগ্যতা হারিয়েছেন। স্বভাবতই বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ বিশাল মানবগোষ্ঠী অসংগঠিত। আরও পরিতাপের বিষয় হল সাম্প্রদায়িকতার অনুগামী মানুষজনকে সংগঠিত করার মত রাজনীতিক-সামাজিক একাধিক সংগঠন ভারতে আছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে জামায়েতে-ইসলামী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, শিবসেনা প্রভৃতির কথা বলা যায়। কিন্তু ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের বিকাশ ও বিস্তারের সহায়ক কোন সুসংগঠিত ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থা গড়ে উঠেনি। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করার কোন সুব্যবস্থা এদেশে এখনও পরিলক্ষিত হয় না। এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তুলে ধরার জন্য তেমন কোন আন্দোলন দেশবাসীর মধ্যে দানা বাঁধে নি।

(চার) মুসলমানদের পৃথক ব্যক্তিগত আইন ॥ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে আর একটি বড় বাধা হল দেশের বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আইন। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে যে অন্যতম নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে রাষ্ট্র সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী বিধি (Uniform Civil Code) প্রবর্তনের চেষ্টা করবে। বিবাহ, উত্তরাধিকার, নারীজাতির অধিকার প্রভৃতি পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থা বর্তমান। সমাজ জীবনের এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিধি-বিধান ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রতিবন্ধকতার অপসারণের জন্য ভারতের সকল জনসম্প্রদায়ের জন্য অভিন্ন

দেওয়ানী আইন অপরিহার্য। ভারতের রাষ্ট্র কর্ণধাররা কিন্তু সংবিধানের ৪৪ ধারার নির্দেশমূলক নীতিকে পুরোপুরি কার্যকর করতে পারে নি। ভারত সরকার শিখসমেত সকল হিন্দুদের জন্য একই দেওয়ানী বিধি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করছে। কিন্তু মুসলমানদের এই দেওয়ানী বিধির আওতায় আনা হয় নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের পৃথক ব্যক্তিগত আইন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং ভারতে ধর্মীয় ভিত্তিতে সরকার দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যমূলক আচরণ করছে। এই নীতি ও আচরণের দ্বারা ভারত রাষ্ট্র নাগরিকদের রাজনীতিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের পার্থক্যকে কার্যত উপেক্ষা করেছে। এবং এই কাজের দ্বারা ভারত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার পথ থেকে বহুলাংশে বিচ্যুত হয়েছে। এস. এল. সিক্রি (S. L. Sikri) তাঁর *Indian Government and Politics* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "The establishment of a uniform civil code throughout the territory of India is the *sine qua non* of a truely secular society. But the passage of Muslim Women Bill, to all intents and purposes, bids adick to this long cherished goal envisaged in Article 44."

(পাঁচ) পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক ।। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কও এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্যাদির সৃষ্টি করেছে। সীমান্তের ওপার থেকে মৌলবাদীদের প্ররোচনামূলক বক্তব্য এ দেশের মুসলমানদের একটি অংশকে প্ররোচিত করে। এই প্ররোচনামূলক কাজকর্ম ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যায়।

(ছয়) শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানী বিধির অন্তর্ভুক্ত করা ।। শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করার জন্য সমকালীন ভারত সরকারের উদ্যোগও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে আঘাত করেছে। সুপ্রীম কোর্ট শাহবানু মামলায় যে রায় দেয় তাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ডিভোর্সী মহিলার জন্য সমান ভরণপোষণের কথা বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে অধিকতর শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল একটি সঠিক ও দৃঢ় পদক্ষেপ। মুসলমান মৌলবাদীরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করার জন্য মৌলবাদী মুসলমানরা শরিয়তের বিধিব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানী আইনের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। শ্রীরাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করার জন্য রাজনীতিক ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদীর এই ভূমিকা অত্যন্ত আপত্তিকর। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার অনুগামী কমিউনিস্ট রাজনীতিক শক্তিগুলিও রাজীব গান্ধীর সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার মত সাহস দেখাতে পারেনি। কিন্তু তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল অংশকে নিয়ে মুসলমান মহিলাদের অনুকূলে আন্দোলন সংগঠিত করে।

(সাত) রাজনীতিক দল ও নেতাদের ভূমিকা ।। দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনীতিক দল ও রাজনীতিক নেতাদের ভূমিকা ভারতকে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার পথে একটি প্রবল প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। ভারত-রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন ও আদর্শ সম্পর্কে দেশে রাজনীতিক দলসমূহ এবং রাজনীতিকরা গালভরা বুলি আউড়ে সাত কাহন করেন; কিন্তু এঁরাই আবার সংসদীয় রাজনীতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিক ফায়দা লুটার জন্য ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেন। এস. এল. সিক্রি (S. L. Sikri) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "There is hardly a party which has not exploited communal and caste affiliations for electoral purposes. This practice of non-secularism has undermined the objective of democracy." সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা বা রাষ্ট্রের কর্ণধাররা বিভিন্ন মঠ মন্দিরে মহাসমারোহে পূজা-পাঠের ব্যবস্থা করেন ও নিজেরা অংশগ্রহণ করেন; তাঁরা বিভিন্ন ধর্মগুরু, পুরোহিত, গডম্যান ও বাবার চরণে আশ্রয় নেন। রাজনীতিবিদ্‌দের এই সমস্ত ধর্মীয় কার্যকলাপ রাজনীতিক গিমিক হিসাবে গণ্য হয়। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অনুরূপ কোন পদাধিকারীর এ ধরনের কাজকর্ম ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে হীনবল করে এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার, মতান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী করে। সুতরাং শুধুমাত্র মৌলবাদীরা বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ্‌রাই নয়, দেশের রাজনীতিক দলগুলি এবং রাজনীতিকরাও বিদ্যমান রাজনীতিক প্রক্রিয়াকে কলুষিত করে। রাজনীতিক দলসমূহের স্ব-স্ব আদর্শভিত্তিক রাজনীতিক কর্মসূচী আছে। দলের নেতা ও সদস্যরা তদনুসারে পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যবহারিক রাজনীতিতে তাঁরা ধর্মকে ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন না। এস. এল. সিক্রি (S.L. Sikri) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "But everyone exploits such traditional institutions and values as caste, religion, sect, ethnic membership, region, language and class in order to secure votes. No wonder, traditional institutions are strengthened in the process. This is, in no way, conducive to the making of secular India."

(আট) সংরক্ষণের সরকারী নীতি ॥ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ নীতিও ধর্মনিরপেক্ষতার পথে একটি বড় বাধা হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতে বহু ও বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের মধ্যে আবেগপূর্ণ সংহতির মানসিকতা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার সহায়ক। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং নাগরিকতার দায়-দায়িত্বের ধারণা অধিকতর শক্তিশালী হলে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু জাতিগত বিচারে সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারী নীতি এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সংরক্ষণের নীতি সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থকে শক্তিশালী করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সহিষ্ণু হবে এবং অন্য সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলবে; অনুরূপভাবে সংখ্যালঘুরাও অন্যোন্যতাসূচক আচরণ করবে এবং বিচ্ছিন্নতাবোধকে পরিহার করবে।

(নয়) মানবিক মূল্যবোধ ও সভ্য জীবনযাত্রা পদদলিত ॥ আর্থনীতিক বৈষম্য, নিদারুণ দারিদ্র্য ও বঞ্চনা ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর একটি বড় বাধা। ভারতে ন্যায়সঙ্গত আর্থনীতিক ব্যবস্থা বিকশিত হয় নি। স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দী ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। এতদ্‌সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বাধিক দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের বসবাস এই ভারতভূমিতে। জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ মাত্র কুড়ি শতাংশ মানুষের দখলে। দেশের আশি শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান অতিমাত্রায় নিম্ন। এই আশি শতাংশের অর্ধেক মানুষ আর্থনীতিক বঞ্চনা ও অমানবিক শোষণের শিকার। দারিদ্র্যের জ্বালায় এরা কাতর। ভারতের এই দরিদ্র জনতার মানবিক মূল্যবোধ এবং সভ্য জীবনযাত্রা পদদলিত। এ রকম পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ব্যাহত হতে বাধ্য। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি মূল উপাদান হল মানবিক মূল্যবোধ ও সভ্য জীবন যাপন। বস্তুতঃ ন্যায়সঙ্গত আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিকাশ ব্যতিরেকে কোন সমাজব্যবস্থা, সরকারী ব্যবস্থা, রাজনীতিক মতাদর্শ শক্তিশালী বা সফল হতে পারে না। এবং এ রকম ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। এস. এল. সিক্রি (S. L. Sikri) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "The wide economic gap between the rulers and the ruled also accounts for the tardy progress of secularism............The two different sets of standards can hardly promote egalitarianism which lays emphasis on the social and economic equality of citizens. This is detrimental to the growth of secularism."

(দশ) ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ-তার ভিত্তি দুর্বল ॥ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী ঐতিহ্যবাদী, ধর্মভীরু এবং রক্ষণশীল। নতুন আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করতে এরা অপারগ। সনাতন জীবনধারার লোকাচার-লোকনীতির ও প্রথা-প্রকরণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে এরা মুক্ত নয়। সনাতন জীবনধারার এই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পারলে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ প্রশস্ত হতে পারে না। এই কারণে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা জনসাধারণের সামগ্রিক চেতনার বৃহত্তর ভিত্তিতে বিকশিত হতে পারেনি। ভারতীয় অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এই কারণে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এই দুর্বলতা দূর করা দুরূহ। সিক্রি (S.L.Sikri) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "..........Secularism in India does not owe its inspiration to the will of the people. The national leaders of the freedom movement were the sole interpreters of the Indian concept of secularism. So it continues to have weak foundations." আবার অনেকের অভিমত অনুসারে ভারতের সমাজব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সম্যক বিকাশের সহায়ক নয়। কারণ এ দেশের মানুষ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। এ প্রসঙ্গে বেগ (M. R. A. Baig) তাঁর *The Muslim Dilemma in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: ".......it (secularism) has been imposed on a society which is basically unsuited to its growth. Too much conscious of their social and religious indentities, the Indian people in general present a country emotionally balkanised. To impose secularism on such a country and then expect it to grow is likely to prove as successful as making omelette out of hard boiled eggs."

(এগার) মৌলবাদী মুসলমানদের অনমনীয় মনোভাব ॥ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শের সীমাবদ্ধতার জন্য মৌলবাদী মুসলমানদের দায়িত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি অংশ হিন্দুদের পাশাপাশি সদ্ভাব-সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে অপারগ বা অক্ষম। মুসলমান ব্যক্তিগত আইনের মত বিভিন্ন বিষয়ে অসঙ্গত ও অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ না করে, মৌলবাদী

ভারতীয় মুসলমানরা দেশের বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক শোভনতার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করলে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয় না। এ প্রসঙ্গে উইলফ্রেড স্মিথ (Wilfred C. Smith) তাঁর *Islams in Modern History* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: " .....that it is the Indian Muslims, not the Hindus,....living in a country dominated by non-believers or infidels who should take the initiative in achieving a *modus vivendi* with the majority community."

(বার) সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ।। সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে একটি অন্তরায়। ভারতকে একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সাম্প্রদায়িকতার অবসান অপরিহার্য। এবং এ ক্ষেত্রে ভারতের সকল অধিবাসীর সদর্থক উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সকল রকম সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধনের স্বার্থে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উচিত অন্য সম্প্রদায়ের আবেগ-অনুভূতিকে মর্যাদা দেওয়া। ভারত বিভাগের ঘটনা হল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণাম। এই সাম্প্রদায়িকতার বিনাশের ব্যাপারে গণপরিষদে সংবিধান-রচয়িতাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার অবসান অনিবার্য। এই ছিল সংবিধান-রচয়িতাদের আশা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার অবসানের আশা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে। রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক দলসমূহ ও রাজনীতিকরা নির্লজ্জভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ-রাজের সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির অপ্রীতিকর পরিণামের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কোন সুসংহত ও সদর্থক উদ্যোগ-আয়োজন স্বাধীন ভারতে পরিলক্ষিত হয় নি। ধর্মনিরপেক্ষ জীবনধারার বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারে তেমন কোন আন্তরিক চেষ্টাও দেখা যায় নি। বরং রাজনীতিক স্বার্থ সাধনের জন্য রাজনীতিক দল ও রাজনীতিবিদ্‌রা সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে ভারতের মানুষ নিজেদের প্রথমে হিন্দু, মুসলমান, শিখ বা খ্রীস্টান হিসাবে বিবেচনা করে এবং তারপর ভারতীয় হিসাবে পরিচয় দেয়।

(তের) শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা ।। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থার সদর্থক ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে হতাশজনক। এ বিষয়ে কোউসার আজম (Kousar J. Azam) তাঁর *Political Aspects of National Integration* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে প্রবিষ্ট করতে পারেনি। ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার পীঠস্থানে পরিণত হতে পারে নি। পরমতসহিষ্ণুতা, হৃদয়ের উদারতা, দেওয়া-নেওয়ার মনোভাব প্রভৃতিকে বিকশিত করে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে দূরত্ব দূর করে শিক্ষাব্যবস্থা সদ্ভাব-সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে এই শিক্ষাব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও আবেগ-অনুভূতিকে শক্তিশালী করেছে।

(চৌদ্দ) বড়মাপের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অকালমৃত্যু ।। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের আশানুরূপ বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুকূল ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে দেশের সমকালীন জননেতারা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, রফী আহমেদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জাকির হোসেন, নেতাজী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ সর্বজনশ্রদ্ধেয় অবিসংবাদিত জাতীয় নেতারা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করার ব্যাপারে এঁরা সতত সংগ্রাম করে গেছেন। কিন্তু ভারত ও ভারতীয়দের দুর্ভাগ্য যে এই সমস্ত জাতীয় নেতারা দীর্ঘজীবী হন নি। তার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ও বিস্তারের জন্য সদর্থক সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ভারতবাসী এ রকম বড় মাপের জাতীয়তাবাদী নেতা পরে আর পায় নি। স্বভাবতই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন কালক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে।

(পনের) বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা ।। স্বাধীন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্বও কম ছিল না। ন্যায়সঙ্গত আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল অতিমাত্রায় অভিপ্রেত। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা সে ভূমিকা পালন করেন নি। স্বাধীন ভারতের বুদ্ধিজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ক্ষমতা ও অর্থের লালসা আচ্ছন্ন করে ফেলে। সমকালীন ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রনেতারাও নিজেদের সংকীর্ণ রাজনীতিক স্বার্থ সাধনের জন্য বুদ্ধিজীবীদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেন। তার ফলে কালক্রমে এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বর্তমান ভারতে উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ভারতীয়দের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উপর এই উদারমনা বুদ্ধিজীবীদের তেমন কোন কার্যকর প্রভাব নেই বললেই চলে।

(ষোল) **সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের ভূমিকা ॥** পণ্ডিত নেহরু এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরবর্তীকালের রাষ্ট্রকর্ণধাররা ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে নৈতিক দৃঢ়তার এবং উদ্যোগের আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান করতে পারেন নি। দেশ ও দেশবাসীর কাছে এই সমস্ত রাজনীতিক কর্তাব্যক্তিরা ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে পারেন নি। বরং এই সমস্ত রাজনীতিকদের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এই শ্রেণীর তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ্‌রা দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক দলগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য প্ররোচনামূলক মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরাই আবার রাজনীতিক সমর্থনের ভিতটিকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার সংকীর্ণ স্বার্থে সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি। দেশের মানুষের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ করতে পারেন নি; বরং নিজেরাই ধর্মনিরপেক্ষতার যাবতীয় নিয়ম-নীতিকে লঙ্ঘন করেছেন। এই সমস্ত সুবিধাবাদী রাজনীতিকরাই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটিকে সংকীর্ণ রাজনীতিক স্বার্থে অপব্যবহার করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের অনুগামী তাঁরা হতাশ হয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিসমূহ হীনবল হয়ে পড়েছে। সিক্রি (S. L. Sikri) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "The failure of leaders of goodwill, culture and courage to come forward and reaffirm their faith in national values and redefine secular principles has been another misfortune for the growth of both nationalism and secularism in the country."

উপসংহার ॥ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা নতুন মাত্রাযুক্ত হওয়া দরকার। সংবিধানে ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভারত হল একটি উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই সাধু ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সাধ্যমত সক্রিয় হওয়া দরকার। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ করা একান্তভাবে অপরিহার্য। এই কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার পথের প্রতিবন্ধকসমূহকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আয়োজন গৃহীত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সকলের সদর্থক সহযোগিতা অভিপ্রেত।